Women's Education in colonial Bengal

PG 4th. Sem. Paper 404, Unit-III

Shyamapada Shit (Assistant Professor of History)

প্রাক ঔপনিবেশিক বাংলায় নারীদের বিদ্যালয় শিক্ষার কোন সুযোগ নিম্ন বা উচ্চ স্তরের পরিবারের মধ্যে ছিলনা। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে বাংলার শিক্ষীত সমাজে এক বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই সময় শিক্ষীত সমাজের মধ্যে যে প্রগতিশীল চিন্তা ধারার জন্মদিয়ে ছিল তা নবজাগরনের সহয়ক হয়।উনিশ শতকে বাঙালী সমাজে মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে তেমন উৎসাহ ছিলনা এই সময় মনে করা হতযে যদি নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটে তাহলে তা সমাজের পক্ষে বিপৎজনক ,এবং মেয়েদের শিক্ষাদেওয়া হল একপ্রকার অশাস্ত্রীয় আচরন। ১৮৭৬ সালে স্যার উইলিয়াম অ্যাডাম মন্তব্য করেছেন যে হিন্দুও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় নারী শিক্ষা বিষয়ে কুসংস্কার ছিল। উক্ত পর্বে মানুষের মনে দুটি বিষয় কাজ করেছিল -

১। যদিমেয়েদের মেয়েরা লেখাপড়া শেখে তাহলে তারা বিবাহের পর বিধবা হবে এবং অসতী হবে।
২।নারী শিক্ষার প্রসার ঘটলে নারী পুরুষ তান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে।

উল্লখ্য হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রে নারী শিক্ষার সমর্থন পাওয়া যায়।প্রাচীন ভারতে অসংখ্য মহিলার সন্ধান পাওয়া যায় যারা শিক্ষাদীক্ষায় বিশেষ উন্নত ছিলেন, এবং পরুষের সমকক্ষ অর্জন করেছিলেন এদের মধ্যে উল্লখ্য যোগ্য হলেন গার্গী,অপলা লোপামুদ্রা,রুক্মিনী, লীলাবতী,মৈত্রিয়ী,ইত্যাদি। মধ্যযুগে একটা অন্ধকার নেমে আসে। সমাজ জীবনে নেমে আসে নানা অবক্ষয়। সামাজিক আচরনবীধির অক্টোপাশে নারীসমাজ অবরুদ্ধ ছিল। তা সত্বেও বাংলা সাহিত্যে বিদ্যার মতো বিদুষীর সাক্ষাত পাওয়া যায়। ইংরেজ রাজত্বের প্রাক্কালে অ্যাডামের বিবরনী থেকে আমরা জানতে পারিযে সে সময় নারী সমাজ ছিল তিমিরান্তক অন্ধকারে। আর তাদের হতাশা দুর্দশার অন্ত ছিলনা। সামগ্রিক ভাবে নারীদের মধ্যে শিক্ষার কোন সুযোগ ছিলনা। উল্লেখ্য তৎকালিন অনেক জমিদার পরিবারে নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিশেষ উদ্দোগ গ্রহন করা হয়েছিল। এদের মধ্যে উল্লেখ্য যোগ্য হল বর্ধমান রাজপরিবার, কৃষ্ণনগর রাজপরিবার, শোভাবাজার রাজপরিবার ছিল বিশেষ উল্লেখ্য যোগ্য। অভিজাত পরিবারের মহিলাদের দুপুর বেলায় বই না হলে আসর জমত না। উনিশ শতকের সূচনাতে গৃহস্ত পরিবারের অনেক মেয়ে বিয়ের পূর্বে একটু আধটু লেখা পড়ে শিখতো ,কিন্তু বিয়ের পর পারিবারীক কারনে তার আর সম্ভব হতোনা। ১৮৪৯ এর ক্যালকাটা রিভিউ থেকে জানতে পারা যায় যে এক যুবতী বধূ তার বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় পথের ক্লান্তি দূর করার জন্য পালকীর সঙ্গে বেশ কয়েকটি বই সঙ্গে নিয়ে ছিলেন। এথেকে অনুমান করা হয় যে উনিশ শতকে বাংলায় অনেক পরিবারে মেয়েদের মধ্যে প্রাক-বিবাহ পর্বে লেখাপড়ার ব্যাবস্তা থাকলে ও পরবর্তী কালে সাংসারীক কারনে তার আর সম্ভব হয়নি।

উনিশ শতকে নারীশিক্ষাকে কেন্দ্র করে সমাজে যখন তুমুল তর্ক বিতর্ক চলছে ঠিক তখন এই মহান লক্ষে এগিয়ে এসেছিলেন কিছু সুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এদের মধ্যে প্রথম সরিতে বিরাজ করছেন খ্রীষ্টান মিশনারী গন। আধুনিক ভারতের জনক রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন মহৎ কর্মসূ গ্রহন করেন, ১৮১৫ সালে আত্মীয়সভা কর্মসূচিতে রামমোহন রায় নারী অধিকার ও শিক্ষা বিষয়টিকে সংযুক্ত

Scanned with CamScanner

করেছিলেন। উল্লেখ্য নারী শিক্ষার উন্নয়নে রামমোহন যেখানে দুচার কথা লেখাছাড়া বেশি কিছু করতে পারেননি সেখানে অনেক বেশি উদ্যোগ দেখিয়েছিলেন রাধাকান্ত দেব।

নারী শিক্ষা আন্দোলন যখন সমস্ত দেশ ব্যাপী উত্তাল হয়ে উঠেছে থখন পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ । বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য উৎসাহীত হয়েছিলেন। ১৮৫০ সালে বেথুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের সময় তিনি বিশেষ উৎসাহিত হয়েছিলেন এবং তাতে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৫৭সাল থেকে ১৮৫৮ সালের মধ্যে বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন এগুলি হল হুগলী জেলায় ২০টি, মেদিনীপর জেলায় ৩টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি, নদীয়ায় ১টি।এই বিদ্যালয় গুলির জন্য মাসিক খরচ হত ৮৪৫টাকা। ছাত্রির সংখ্যা ছিল ১৩০০। বিদ্যাসাগরের এই প্রচেস্টা ইংরেজ সরকারের নজর কেড়েছিল। একটি সরকারী রিপোর্ট এক্ষেত্রে স্বরনীয় ''ভারত সরকার ২২ শে ডিসেম্বর ১৮৫৮ খ্রীঃ লেখেন - দেখযাচ্ছে যে পন্ডিতমশায় ৯বিদ্যাসাগর) অন্তরিক বিশ্বাসের বশবতী হয়ে এবং উপরের সরকারী কর্মচারীদের উৎসাহ ও সম্মতি পেয়ে এ কাজ (বালিকাদের শিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যালয় শথাপন) করেছেন। একথা বিবেচনা করে এই সমস্থ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য যে ৩৩৪৩৯ টাকা ২১ পয়সা মোট ব্যয় হয়েছে ,সেটাকার দায় থেকে মুক্তি দেওয়া হল। সরকার এই টাকা দিয়ে দেবেন। পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র প্রতিষ্টিত বালিকা বিদ্যালয় গুলির অথবা অন্য সরকারী চিঠিপত্র 'সেক্রেটারী অব. স্টেটের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য অনধিক ১০০০ টাকা সাহায্যের অনুরোধ তাকে জানানো হবে ।টাকা পাওয়া গেলে কিছুটা বিদ্যাসাগর প্রতিষ্টিত স্কুলগুলির সাহায্যের জন্য এবং কিছুটা সরকার সমর্থিত মডেল স্কুল গুলির জন্য ব্যয় করা হবে। (বলা বাহুল্য সেক্রেটারী অব. স্টেট এই ১০০০ টাকা মঞ্জুর করা হবে।)„

১৮৮২ সালে হান্টার কমিশন নারী শিক্ষার অগ্রগতি সর্ম্পকে বিস্তৃত রিপোর্ট দিয়েছিলেন। এবং জানিয়ে ছিলেন যে এ দেশের শতকরা ৯৯.৫% নারী অশিক্ষিতা ।সরকারী নিয়ম শিথিলকরে বেসরকারী নারী বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্যদানের সুপারিশ করা হয়ে ছিল। বিনা বেতনে শিক্ষাদান, ১২ বছরের উপর নারীদের বিদ্যালয়ে আগমনে উৎসাহ দান , শিক্ষিকা শিক্ষনের জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপন , নারী পরিদর্শিকা নিয়োগ, পাঠত্রমকে নারীদের পক্ষে উপযোগী করে তোলা ইত্যাদি বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন।এরপর স্যাডলার কমিশন (১৯১৭-১৯১৯)স্ত্রী শিক্ষার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বোর্ড গঠন করেছিলেন। এবং ১৬ বছরের মেয়েদের জন্য পর্দাভিত্তিক শিক্ষার ব্যাবস্তা করা হয়। হার্টগ কমিটির রিপোর্টে দেখাযায় যে গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য প্রথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে কিছু বিদুৎশাহী ব্যাক্তি নারী শিক্ষার উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৮৩৬-৬৭ সালের মধ্যে বাংলায় ১৯টি সংস্থা স্থাপিত হয়। এই রকম একটি সংস্থা হল উত্তরপাড়া হিতকারী সভা। ১৮৩৬ সালে হরিচরন মুখপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজনের প্রচেস্টায় হুগলী হাওড়া, ও উত্তর ২৪ পরগনায় স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য বিভিন্ন সভা সমিতির আয়োজন করা হয়। ১৮৬৩ সালে এই সভা বৃত্তি পরীক্ষার আয়োজন করে। যে সমস্ত মহিলা অন্তপুর থেকে লেখাপড়া করত তাদের জন্য এই সভা পরীক্ষার ব্যাবস্তা করে দিত। এবং ১৯১৫ সাল পর্যন্ত কোন ফি ব্যাতিত এই পরীক্ষার ব্যাবস্তা করা হত। উল্লেখ্য ১৮৬৮-১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এই সভার নেতৃত্বে যে পরীক্ষার ব্যাবস্তা করা হয়ে ছিল তাতে ৮০ জন ছাত্রী পাশ করে। ১৯০৬ সালে ১লা ডিসেম্বর বরোদার মহারানি উদ্ধোধন করে ছিলেন বেথুন কলেজের একটি মহিলা সম্মেলনের ।সরোজিনী নাইডু ও এই সভার একজন অন্যতম প্রধান বক্তা ছিলেন এই সভায় তিনি বলেছিলেন ''তোমাদের

Scanned with CamScanner

নারী সমাজকেই শিক্ষিত করে গড়ে তোল তাহলেই জানি নিজেই নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে। দোলনা দোলায় যে হাত সেই হাতেই আছে বিশ্বশাসনের ক্ষমতা, একথা অতীতে সত্য ছিল। এখনো সত্য এবং মানব সভ্যতার শেষ দিন প্রর্যন্ত থাকবে। বেথুন কলেজের সভায় তিনি বলেছিলেন দুঃসহ বশ্যতা ভেঙে নারী সমাজ যেন পুরুষের সহযাত্রী হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সরলাদেবী ছৌধুরানীর সঙ্গে সরোজিনী নাইডুর সুসর্ম্পক গড়ে উঠে তাঁদের আন্তরীক প্রচেষ্টায় নারী শিক্ষার অগ্রগতি ঘটে। ১৯১৮ সাল থেকে কলেজ ছাত্রী সংখ্যা অভাবনীয় ভাবে বৃদ্বি পায়। ১৯১৯-২২ সালের মধ্যে যে পত্রিবেদন পাওয়া যায় তাতে দেখতে পাওয়া যায় যে এই সময় মেয়েদের হোস্টেলের প্রয়োজন হয় তাই নির্মান করা হয় হোস্টেল। ১৯২৭-১৮ সালে বেথুন কলেজে ছাত্রী সংখ্যা অভাবনীয় ভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৩০ সালে বেথুন কলেজে ছাত্রী সংখ্যা হ্রাস পায়। ১৯৩১-৩২ সালে এই কলেজে ছাত্রীর সংখ্যা তা আবার ভালো হয়। উল্লেখ্য এই সময় বেথুন কলেজে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করে ৩৯৮জন, ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় ১৮৩ জন, বি.এ পরীক্ষায় ৪৪জন, এম. এ. পরীক্ষায় ১০ জন। ১৯৩২-৩৩ সালে নারী শিক্ষার উন্নতির সুবাদে কলেজের সংখ্যা ও বৃদ্ধিপায়। ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় নারী শিক্ষার ব্যাহত হয়। এরপর আবার ১৯৪৭ সালের পর ভারত স্বাধিন হলে নারী শিক্ষার উন্নয়ন হয়।

মুসলিম সমাজে মেয়েদের মধ্যে লেখা পড়া সঙ্গত কিনা তা নিয়ে তীব্র বাগবিতান্ডা সৃস্টিহয়। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে মিহির ও সুধাকর যুক্তি দেখিয় যে মেয়েদের লাখা পড়ার প্রয়োজন আছে কিন্তু তার পরিসর বেঁধে দেওয়া উচিত। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে আল ইসলাম পত্রিকার মুসলিম মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাদান সর্ম্পকে মত দেওয়া হয়। ১৯১৯ সালে সোগাত পত্রিকায় নুরুন্নেসা খাতুন বলেন যতদিন না প্রযন্ত মুসলিম মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল হচ্ছে ততদিন অন্তঃপর হবে মেয়েদের শিক্ষার স্থান। এই পত্রিকায় বলা হয় যে বাড়ির বাহিরে গিয়ে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষাদান সমাজের পক্ষে অকল্যানকর।

আবার অনেক পত্রপত্রিকায় মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার পক্ষে সমর্থন করা হয়। সৈয়দ আমীর আলি বলেন মুসলিম মেয়েদের এই দুর্দসার জন্য পুরুষরাই দায়ী। ঢাকার মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতা কাজী মোতাহার হোসেন ১৯৩১ সালে সওগাত পত্রিকায় লেখেন মেয়েদের এমবয়ডর,রন্ধন, পত্র লিখন শিক্ষার জন্য গৃহে আবদ্ধ রাখা অবাস্তব ও আপত্তি জনক। তার মতে শিক্ষার জগৎ দর্শন,ইতিহাস, সাহিত্য,ইত্যাদি থেকে শুরুকরে ডাক্তার বা আমলা হওয়ার জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। এরপর বাঙলায় মুসলিম মেয়েদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্টান গড়ে উঠে।

প্রাচীনকাল থেকে ইংরেজ আগমনের পূর্বে ভারতের মোগল সাম্রাজ্যে ছিল এবং তার শেষপাদে এসেছিল নানাদিক থেকেই সামাজিক-অর্থনৈতীক ও সাংস্কৃতিক আবক্ষয়। তা সত্বেও ভারতের একটি মূল জীবনশক্তিক্ষীন হয়ে আসলে ও কিন্তু অবলুপ্ত হয়নি। ইংরেজ আগমনের পুর্বে এদেশে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সমান্তরাল শিক্ষার একটি ধারা চালু ছিল। ইংরেজ কোম্পানীর আমলে সর্বর্প্রথম চেষ্টা হয় সমগ্র দেশের শিক্ষার বাস্তব চিত্র সর্ম্পকে সমীক্ষা করার। এই কাজে মনরো, এলফিনস্টোন, অ্যাডামের ভূমিকা স্বরনীয়। ১৮১৩ সালে ইংরেজ কোম্পানী তার শিক্ষা সনদ ঘোষনা করেন। এ দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। এবং অর্থব্যায় করার সিধান্ত নিয়েছিলেন। এই কালে বাংলায় শ্রীরামপুর মিশনের কার্যধারা প্রসারিত হয় কেরী, মার্শম্যান ওয়ার্ডের প্রচেষ্টায়। ভারতে অধুনিক যুগের শিক্ষা উন্মেষের ফলে শ্রীরামপুর মিশন, ফোর্ডউইলিয়াম কলেজ, হিন্দুস্কুল প্রতিষ্টা প্রভৃতি ছিল অবিস্বরনীয়। সেই সঙ্গে রামমোহন,বিদ্যাসাগর, প্রমুখ রেনেসাঁস আন্দোলনের নেতাদের প্রেরনা, এবং উডেরডেসপ্যাচ, হান্টার কমিশন,স্যাডলার কমিশন, হার্টগ কমিশন, কার্জনের শিক্ষানীতি ,ইত্যাদি রিপোর্টের মধ্যে অনেক শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক উপাদান আছে অতি তাৎপর্যপূর্ন। প্রশঙ্গক্রমে উল্লেখ্য ইংরেজ আমলে নারী শিক্ষার প্রসার শুরুহলেও সরকার এই শিক্ষার বিষয়ে চরমভাবে উদাসিন ছিলেন। নারী শিক্ষার প্রগতি যেটুকু হয়েছিল তা বেসরকারী উদ্যোগের ফল।সুতরাং ওপনিবেশিক শাসনকালের উত্তাধিকারী সূত্রে পাওয়া শিক্ষাব্যাবস্তা ছিল কিছূটা সমাজের ওপরতলার মানুষদের জন্য। সমাজের সকলের মধ্যে শিক্ষার অধিকার অনেক পরে এসেছে।

Scanned with CamScanner

Environmental movement and modern Indian Women's

PG 4thSem. Paper-402 Unit-IV

Shyamapada Shit (Assistant Professor of History)

নারী ও পরিবেশ ভিন্ন কোন সত্তা নয় বরং একে অপরের পরিপুরক।আর এই সূত্র ধরে একোফেমিনিজম কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। প্রকৃতির এই ধ্বংসের জন্য দায়ী ক্ষমতা লোভী স্বর্থপর কিছু মানুষ। উল্লেখ্য যদি দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দুতে থাকত নারীর প্রকৃতি প্রেমী চেতনা তাহলে হয়ত এই এত পরিবেশের অবক্ষয় ঘটত না। নারী প্রকৃতি প্রমী বলে তার মধ্যে এই প্রকৃতিকে রক্ষা করার তাগিদ অনেক বেশি লক্ষ করা যায়।পরিবেশ কেন্দ্রিক নারীবাদের স্বপক্ষে প্রথমে জোরালো মতবাদ ব্যাক্ত করে ছিলেন মার্কিন লেখিকা র‍্যাচেল কারসন তাঁর নীরব বসন্ত নামক গ্রন্থে।যার মূল বক্তব্য ছিল আধুনিক কৃষিতে কীটনাশক ব্যাবহারের ফলে কীট পতঙ্গ মারা যায় ঠিকি ,কিন্তু এর প্রভাবে ধীর ধীরে মারা যায় পশু পাখি,এমনকি মানুষ ও । ফলে ভবিষৎ এ এমন এক বশন্ত আসতে পারে যে **নিঃশব্দ বসন্তে** একটি পাখির ডাক ও শোনা যাবেনা। র‍্যাসেল কারসন আমাদের দেখিয়েছেন যে বহু জাতিক সংস্থা গুলি কিভাবে পরিবেশ দূষন করে চলেছে।

আধুনিক ভারতে একোফেমিনিজম কথাটি তেমন ভাবে প্রতিষ্টা লাভ না করলেও ভারতীয় নারীর একটি গুরুত্ব পূর্ন ভূমিকা আছে পরিবেশ আন্দোলনে , সাধারনতঃ গ্রামের এবং পার্বত্য অঞ্চলের মহিলারা পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে ওতোপ্রতো ভাবে যুক্ত ছিলেন, কারন অরন্য তাদের নিকট ছিল মায়েরমতো ,অরন্যর উপর নির্ভরকরে তাদের জীবিকা নির্বাহ হতো। পরিবেশ আন্দোলনে নারী যে কত গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করতে পারে তার একটি উদাহরন হল উত্তরাখন্ডের গাড়োয়ালো কুমায়ুন পাহাড়ঞ্চলে নারীদের **চিপকো আন্দোলন।** (১৯৭২-৭৮)।চিপকো কথাটি অর্থ হল জড়িয়ে থাকা। অর্থাৎ গাছকে বাঁচানোর জন্য মহিলারা গাছকে জড়িয়ে ছিলেন যাতে করে অন্যায় ভাবে গাছ কাটা না হয়। ঠিকাদাররা গাছ কাটতে এলে গ্রামবাসী মহিলারা গাছকে জড়িয়ে ধরতো এরফলে ঠিকাদার গাছ কাটতে পারতোনা। হিমালয় পাহড়ী অঞ্চল থেকে গাছ কাটার রেওয়াজ বহুদিন থেকে চলে এসে ছিল ,কিন্তু অত্যাধীক গাছ কাটার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হবে ,এবং ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পায়। এর ফলে কৃষি কাজের ব্যাঘাত ঘটে , এছাড়া নদী তার গতিময়তা হারিয়ে ফেলে।সেই সঙ্গে পারিবারীক পশুদের খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য মহিলাদের বহুদূরে যেতে হয় ।তাই গাছকে বাঁচানোর জন্য গড়ে উঠে চিপকো আন্দোলন যে অন্দোলনে নারী সমাজ এক গুরুত্ব পূর্ন ভূমিকা পালন করেছিলে

চিপকো আন্দোলন হল এক পরিবেশ আন্দোলন। উত্তর খন্ডের মন্ডল গ্রামের,এবং রেনী গ্রামে এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারন করে, এখান কার মহিলাগন গৌরাদেবীর নেতৃত্বে আন্দোলন করেছিলেন। এবং বলেছিলেন অরন্য আমাদের মা একে আমরা রক্ষা করবো আমাদের প্রানের বিনিময়ে, তাই ঠিকাদাররা যখন গাছ কাটতে আসে তখন মহিলারা গাছকে জড়িয়ে ধরে থাকতো , অথাৎ গাছ কাটার পূর্বে তাদের কাটতে হবে। এই ভাবে নারী সমাজ পরিবেশকে রক্ষার জন্য নিজের প্রান উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। চিপকো আন্দোলন প্রথমে বিভিন্ন স্থানে লক্ষ করা গিয়ে ছিল যেমন চামেলি জেলার গোপেশ্বর, কেদার ঘাট, যোশিমঠের বেনি প্রভৃতি স্থানে। উল্লেখ্য চিপকো আন্দোলেনে প্রাথমিক পর্যায়ে পুরুষদের অংশ গ্রহন কম ছিল কারন উক্ত এলাকার অধিকাংশ পুরুষ গাছ কাটার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ,এর ফলে গাছ কাটা বন্ধ হলে তাদের জীবিকায় আঘাত লাগবে এই ভেবে পুরুষ সমাজ আন্দোলন থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন। তাই এই আন্দোলনে নারীদের পরিবারে পুরুষের বিরোধিতার ও সম্মুখিন হতে হয়েছে, তাতে ও পাহাড়ি মহিলারা তাদের লক্ষ থেকে সরে আসেন নি। এবং শেষ পর্যন্ত নারীদের আন্দোলনের চাপে ঠিকাদাররা গাছকাটা থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়।

Scanned with CamScanner

চিপকো আন্দোলনের সঙ্গে যে সমস্ত বিখ্যাত নেতৃবর্গ যুক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন চন্ডীপ্রসাদ ভাট,সুন্দরলালবহুগুনা, সরলাবহিন, গৌরাদেবী, প্রমুখ। চিপকো আন্দোলনে অনেক নারী কারাবরন করেছেন। ১৯৮০ সালে ভারতের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ১৫ বছরের জন্য গাছ কাটা বন্ধ রাখার কথা ঘোষনা করেছেন। উল্লখ্য গাছকে রক্ষা করার জন্য পাহাড়ী অঞ্চলের মহিলারা যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে প্রসংশার যোগ্য। তবে উক্ত স্থানে এখনো বর্তমানে মহিলারা যেমন গাছ কাটা বন্ধ করছে ব্যাবসার উদ্দশ্যে, ঠিক তেমনি পাহাড়ের ধাপে ধাপে অনেক গাছ যেমন পাইন,ওক, লাকিয়ে পরিবেশকে যেমন রক্ষা করে চলেছেন , আবার পরিবেশকে দুষনমুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছেন। চিপকো আন্দোলনের মধ্যে নারী চেতনা ও পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত চেতনা একটি সাধারন মিলন খুঁজে পেয়েছিল। যাকে সমাজ বিঞ্জানের পরিভাষায় বলা হয় Ecofeminism ।

হিমালয়ের পাশাপাশি পশ্চিমঘাট পর্বত মালার জঙ্গলকে রক্ষা করার জন্য ৮০র দশকে দেখা দিয়েছিল **আপ্পিকো আন্দোলন।** সরকারী প্রশাসনের গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসী গন টানা ৩৮ দিন জঙ্গল আটকে রাখেছিলেন। ধীরে ধীরে মধ্য ভারত হয়ে এই আন্দোলন আরবল্লী পর্বাতের গাছ কাটার বিরুদ্বে এই আন্দোলন দেখা দিয়েছিল এর সঙ্গে অসংখ্য নারী যুক্ত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত গাছ কাটা বন্ধ হয়েছিল।

পরিবেশকে রক্ষার জন্য নারীযে কি গুরুত্বপূর্ন ভমিকা পালন করতে পারেন তার অপর একটি উদাহরন হল **নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন।** গুজরাট সরকার এবং মধ্যপ্রদেশ সরকারের যৌথ উদ্দোগে নর্মদা প্রকল্পের কাজ গ্রহন করা হয়েছে যার অর্থহল এই প্রকল্পের আওতায় ৩০টি বড় বাঁধ ,১৩৫টি মাঝারি বাঁধ, ৩০০০টি ছোট বাঁধ নির্মান করার কাজ গ্রহন করা হয়েছে ।এই প্রকল্পের সময় কাল ধরা হয়েছে২৫ বছর। লক্ষ হল গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশের খরা প্রবন জমি গুলিকে চাষের আওতায় নিয়ে আশা এবং এর ফলে অর্থনৈতীক উন্নয়নের কাজ গ্রহন করা হবে।এই প্রকল্পে মোট ২৪৫০ মেগাওয়াট বিদৎৎ উৎপন্ন হবে।এবং ৩৮৪০০হেক্টর জমিকে চাষের আওতায় আনা হবে।

নর্মদা প্রকল্পের এই সুফল পরিবেশ বাদীদের নিকট গ্রহন যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। কারন এর সঙ্গে পরিবেশের স্বার্থ বিশেষ ভাবে জড়িত আছে। তাঁরা মনে করেন যে নর্মদা প্রকল্প রুপায়িত হলে ৯২টি গ্রাম জলমগ্নহবে।এছাড়া ২৯৪টি গ্রাম আংশিক জলমগ্ন হবে। ১০লক্ষের ও বেশি মানুষ বাস্তুহারা কর্মহারা হবে। একটি ৩৫০,০০০ হেক্টর বনভূমিম ও ২,০০,০০০হেক্টর কৃষিভূমি প্লাবিত হবে ।যা পরিবেশের অকল্পনীয় ক্ষতি। তাই এর বিরুদ্ধ তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে ছিলেন শ্রীমতি মেধাপাটেকার, মেধাপাটেকার নর্মদা প্রকল্পের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে তুলে ছিলেন তাকে বলা হয় নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন। বর্তমানে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছেন শ্রীমতি অরুন্ধুতী রায়। এই আন্দোলোনের ফলে বিশ্বব্যাঙ্ক ঋন দেওয়া বন্ধ করেছে । বর্তমান এই বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। এই আন্দলনে নারী যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তা প্রশংশার যোগ্য।

পরিবেশকে দূষন মুক্ত রাখার জন্য নারী বারংবার সেচ্ছার হয়েছেন। আলমোড়ার খিরাকোটে **সোপস্টোন খনন** (১৯৭৫)কাজের বিরুদ্ধে পাহড়ী অঞ্চলের মহিলারা প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন। কারন অবিরাম ডিনামাইট বিস্ফোরনের ফলে পরিবেশের ক্ষতি হয়। তাই পরিবেশকে রক্ষার জন্য মহিলা মন্ডল এবং যুবক মন্ডল একজোট হয়ে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট উক্ত স্থানে খনন কার্য বন্ধ রাখার আদেশ দেন।

Scanned with CamScanner

পরিবেশকে রক্ষায় নারী শ্রেনী যে ভুমিকা গ্রহন করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংশার যোগ্য ,পরিবেশের প্রতি তাদের এই অবদান মানুষ চিরদিন মনে রাখবে।বন্দনা শিবা লিখেছেন নারী এবং প্রকৃতি একে অপরের সঙ্গে বাঁধা ,তাই নারীর আন্দোলন এবং পরিবেশ আন্দোলন এগুলি মূলতঃ পুরুষ তান্ত্রিক সমাজের এক পেশে উন্নয়নের বিরুদ্ধে।উল্লেখ্য মানুষ জেনে শুনে পরিবেশের যে ক্ষতি করে চলেছে তাকে শোধরানোই হবে পরিবেশ আন্দোলনের মূল কর্তব্য।

Scanned with CamScanner